

<https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.2>

## প্রথম বাংলা আত্মজীবনী

লায়লা জামান\*

সারসংক্ষেপ :

এই প্রবন্ধে উনিশ শতকে বাংলা গদ্যে রচিত প্রথম আত্মজীবনী রাসসুন্দরী দাসীর (১৮০৯-১৯০০) *আমার জীবন* (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬) গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। আলাচ্য আত্মজীবনীতে তৎকালের ধর্মীয়, পারিবারিক, সাংসারিক ও সমাজচিত্র অঙ্কনের যে-প্রয়াস তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সংকলন করা হয়েছে মূল বইয়ের। এছাড়া দীনেশচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার সেন ও মুনীর চৌধুরীর মূল্যায়নের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য প্রায় দেড় শো বছর আগে এক স্বশিক্ষিতা মহিলার রচনায় তাঁর সমকালীন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের যে পরিচয় বিধৃত তার স্বরূপ অনুসন্ধান ও উন্মোচন।

রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন* মহিলা রচিত প্রথম আত্মজীবনীই কেবল নয়, বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম আত্মজীবনী। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই আত্মজীবনীর ভাষাগত, সাহিত্যিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

আধুনিক বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের (১৮০০-১৮৫৭) পর সাহিত্য ধারার একটি নতুন আঙ্গিকের সাক্ষাৎ মেলে - আত্মজীবনী। বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবন' রচয়িত্রী রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-১৯০০)। দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে লেখিকা 'আমার জীবন' রচনা করেন (প্রকাশকাল ১৮৭৬)। এই গ্রন্থ প্রকাশের পনের বছর পরে বাংলায় দ্বিতীয় আত্মজীবনী বিদ্যাসাগর রচিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এ। 'আমার জীবন' রাসসুন্দরীর শৈশবকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত নানা ঘটনাবলির বর্ণনা; তাঁর সমকালের সমাজের চিত্র, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনোজগতের পরিবর্তন ও পরিণত মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী 'বিদ্যাসাগর চরিতে' পূর্বপুরুষদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও শৈশব জীবনের বিবরণ আছে। তিনি আত্মজীবনীটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। 'বিদ্যাসাগর চরিত' সম্পর্কে মুনীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন :

\*ইউ.জি.সি.-র রোকেয়া চেয়ার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

‘এই বিরাট পুরুষের মানস কোন উপাদানে গঠিত, কোন পরিবেশে বর্ধিত, কোন ঘটনারাশির দ্বারা সংক্রমিত তার আদিকথা এখানে বলা হয়েছে দুর্লভ সরসতার সঙ্গে।’<sup>৭</sup>

তিনি উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক—এই কালপর্বকে বাঙালির রচিত আত্মজীবনীর স্বর্ণযুগ বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>৮</sup>

আমাদের আলোচ্য বাংলা গদ্যে প্রথম আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’। দীনেশচন্দ্র সেন ‘গ্রন্থ পরিচয়’ দিতে গিয়ে বলেছেন:

‘আমার জীবন’ পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকালে হিন্দু রমণীগণের কথা। এই চিত্রের মতো যথাযথ ও অকপট মহিলা চিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।<sup>৯</sup>

‘আমার জীবন’ সম্পর্কে সুকুমার সেনের অভিমত: ‘মনের কথার এমন সহজ ও নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।’<sup>১০</sup>

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

সেকালে স্ত্রীলোক পুঁথি পড়িলে বিধবা হয়—এই সংস্কার প্রবল ছিল। সেকালের গৃহস্থবধূ হইয়া রাসসুন্দরী কিরূপ অদম্য জ্ঞান পিপাসা লইয়া ও বৃহৎ সংসারের ভারগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে পুঁথি ও পরে ছাপা বই পড়িতে এবং আরও পরে লিখিতে শিখিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ।<sup>১১</sup>

রাসসুন্দরীর সাতষষ্টি বছর বয়সে ‘আমার জীবন’ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দুটি ভাগে উপস্থাপিত, প্রথমভাগে জীবনের নানা খুঁটিনাটি কথা - বাল্যকাল, কিশোরকাল, যৌবনকাল এবং পরিণত বয়সের ঘটনার বিবরণ। দ্বিতীয়ভাগে ঈশ্বরবন্দনা। প্রথমভাগের প্রতিটি রচনার শুরুতে একটি করে কবিতা আছে, দ্বিতীয় ভাগটিতে কবিতাই মুখ্য। ‘আমার জীবন’ তাঁর সমকালের পারিবারিক পরিবেশ ও সামাজিক ইতিহাসের দলিল। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর জীবনকে বৈচিত্র্যহীন মনে হলেও তিনি তাঁর জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে নারী জীবনের যন্ত্রণার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নাকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তাঁর চরিত্রের সরলতা, নির্বুদ্ধিতা ও উৎফুল্লতার গল্প নিঃসঙ্কোচে নিরাভরণভাবে তুলে ধরেছেন। ভগবৎ-পরায়ণ রাসসুন্দরী জীবনকে উৎসুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন। তাই ভগবানের নৈকট্যলাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মানুষকেও কাছে টানার চেষ্টা করেছেন। কন্যা থেকে বধূ, বধূ থেকে গৃহিণী, গৃহিণী থেকে জননী - তাঁর জীবনটা কিভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং একই সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার বর্ণনা পাই। বাল্যের নির্বুদ্ধিতার গল্প তিনি অকপটে

বলে গেছেন, পরিণত বয়সে তা স্মরণ করে কৌতুকবোধ করেন। এ গ্রন্থে সেকালের নারীর ওপর সমাজের নিপীড়ন, তাদের পরাধীনতা ও অমর্যাদার চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অবরোধ প্রথা যে কতটা অমানবিক ছিল তার বর্ণনা পাই। নানা ক্লেশের মধ্য দিয়ে মহিলাদের জীবন যাপন করতে হতো। নারী-স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে না, সমাজ তাদের জন্য যে রীতি তৈরি করেছিল, সেই ঘেরাটোপের মধ্য দিয়েই দিন যাপন করতে হতো। রাসসুন্দরী বর্ণিত সমাজে মহিলাদের অবস্থানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের একটি বর্ণনার সায়ুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়:

বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতিপ্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জন, গৃহ-লেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে।<sup>৮</sup>

পাবনা জেলার পোতাজিয়া নামে এক অখ্যাত গ্রামে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে রাসসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম পদ্মলোচন রায়, অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। রাসসুন্দরীর বাবার কোনো স্মৃতি নেই। স্মৃতি কথায় রাসসুন্দরী মায়ের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু মায়ের কথা কতভাবে বলেছেন; তা থেকে অনুমান করা যায় তাঁর জীবনে মায়ের গুরুত্বই সর্বাধিক। মায়ের সান্নিধ্যে, স্নেহছায়ায় তিনি বড় হয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবারের খুড়ো পিসির কথাও উল্লেখ আছে, যাঁরা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর দুই সহোদরের উল্লেখও আছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা রাসসুন্দরী তাঁর জীবনের ঘরোয়া রূপটিকে তুলে ধরেছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনোজগতের পরিবর্তন ঘটছিল তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি এবং উল্লেখ করেন: ‘আমার এই শরীর, এই মন এই জীবনই কয়েক প্রকার হইল’।<sup>৯</sup>

তাঁর বয়সের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। যেখানে বয়স সম্পর্কে সেকালের অধিকাংশ মানুষ ছিল উদাসীন। কালের স্রোতে নিজেদের ছেড়ে দিতেন। বয়স সম্পর্কে সচেতনতার এই আধুনিক রূপটি তাঁর মনে স্পষ্ট ছিল। ছয় বছর বয়সের পূর্বের কোনো স্মৃতি রাসসুন্দরীর মনে নেই। এরপরের ঘটনাবলী তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। শৈশবেই তাঁর জীবনে একটি গুরুত্ববহ বিষয়ের সন্ধান পাই। আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত তাঁর অভিভাবকগণ তাঁকে নিজেদের বাড়ির স্কুলে বসিয়ে রাখতেন। উদ্দেশ্য লেখাপড়া শেখানো নয়। দুই বালিকাদের নিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোর সময় বয়সের উল্লেখ করতে তাঁর ভুল হয়নি।

শৈশবে রাসসুন্দরী সরল ও ভীক স্বভাবের ছিলেন। তাঁর অপরিশ্রুত বুদ্ধির কথা তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। দশ বছর বয়সে তাঁদের বাড়িতে আগুন লেগেছিল। তিনি সহোদরদের সহযোগে বাড়ি ছেড়ে শ্মশানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শ্মশানের পরিবেশে আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন তিন ভাইবোন উঁচুস্বরে কাঁদতে থাকেন। মায়ের অভয়বাণী স্মরণ

করে তিনি নিজে দয়ামাধবকে (গৃহদেবতা) ডাকেন । এবং ভাইদেরও ডাকতে বলেন । সেখানকার পরিবেশের বর্ণনায় তিনি বলেন:

এদিকে নদী, ওদিকে প্রজ্বলিত অগ্নির ভীষণ ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইতে লাগিল, মনুষ্যের কলরব এবং পরস্পরের কান্নায় পরস্পরে দুঃসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল । তখন আমাদের কান্না কে শোনে । যেখানে আমরা আছি, সেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই' ।<sup>৮</sup>

এই অবস্থায় নদীর অপর পারের লোকজন দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ার পথে শূশানে ক্রন্দনরত তিন ভাইবোনের সাক্ষাৎ পায় । তাদের একজন ভাই বোনদের বাড়িতে পৌঁছে দেন । ঘটনার পরেরদিন কথা প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী তাঁর ছোটভাইকে বলেন:

দয়ামাধব আমাদের বড় ভালোবাসেন । কল্য দয়ামাধব আমাদের কোলে করিয়া বাটিতে আনিয়াছেন ।

উত্তরে ছোটভাই বলে:

দয়ামাধব কি মানুষ? দয়ামাধবের মুখে কি দাড়ি আছে? তখন আমি বলিলাম, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও । কল্য আমরা দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, এজন্য দয়ামাধব আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া বাটিতে আনিয়াছেন । আমার এই কথা শুনিয়া আমার ছোটভাই বলিল, সে দয়ামাধব নহে । সে মানুষ । ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম । ইতিমধ্যে আমার মা আসিলেন এবং আমার কান্না দেখিয়া বলিলেন, উহাকে কাঁদাইতেছ কেন? তাঁহার নিকট আমার ছোটভাই আদ্য-অন্ত সকল কথা বলিল । মা বলিলেন, তোমার ছোটভাই সে সকল কথা বুঝে । তোমার বুদ্ধি নাই । কিছুই বুঝ না ।<sup>৯</sup>

বিবাহিত জীবনেও যে তাঁর অপরিণত বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে তিনি তারও বিবরণ দিয়েছেন । বর্ণনাকালে ঐ ঘটনা স্মরণ করে তিনি নিজেও কৌতুকবোধ করেছেন:

[শ্বশুরবাড়ির] আঙিনাতে রাশি রাশি ধান ঢালা থাকে । ... জয়হরি ঘোড়া প্রত্যহ আসিয়া ঐ ধান খাইত, পাছে ঐ ঘোড়া আমাকে দেখে, এই ভয়ে আমি যদি বাহিরে থাকিতাম, তবে তাকে দেখিবামাত্র ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইতাম । এই প্রকার কত দিবস যায়, এক দিবস আমি পাকের ঘরে ছেলেদিগকে খাইতে দিয়া অন্যঘরে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে ঐ জয়হরি ঘোড়া আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল । তখন আমি ভারি মুশকিলে পড়িলাম । ছেলেদিগকে খাইতে দিয়াছি তাহারাও মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল । কেহ বা কাঁদিতে লাগিল । ঘোড়াও ধান খাইতে লাগিল, যায় না । আমি ভারি বিপদে পড়িয়া আওয়ান পিছুয়ান করিতে লাগিলাম । কি করি কর্তার ঘোড়া, পাছে আমাকে দেখে । এই ভাবিয়া ঐখানেই থাকিলাম । ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলে আসিয়া আমাকে বলিল: মা, ও ঘোড়া কিছু বলিবে না, ও আমাদের জয়হরি ঘোড়া, ভয় নাই । তখন আমি মনে মনে

হাসিতে লাগিলাম। ছি, ছি, আমি কি মানুষ। আমি তো ঘোড়া দেখিয়া ভয় করি না। আমি যে লজ্জা করিয়া পালাইয়া থাকি। ... সে যা হউক, আমার নিজের বুদ্ধির দশা দেখিয়া মনে ধিক্কার জন্মে। আমার কৰ্ম দেখিয়া অন্য লোক তো হাসিতেই পারে। আপন কথা মনে হইলে আপনারি হাসি আইসে।<sup>১০</sup>

আত্মকথা রচনার মধ্য দিয়ে রাসসুন্দরী বারবার তৎকালের পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গির ও মূল্যবোধের কথা তুলে ধরেছেন। নিজের জীবনকাহিনিতে তাঁর সমকালের প্রেক্ষাপটে বিয়ে, বিবাহিত জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, স্বদেশ চেতনা, ধর্মচর্চা, বৈষয়িক বিষয়, মমত্ববোধ, বাৎসল্য প্রেমের উল্লেখ করেছেন।

বারো বছর বয়সে রাসসুন্দরীর বিয়ে হয়। সমাজে প্রচলিত যে রীতি ছিল, তার তুলনায় তাঁর বিয়ে বিলম্বে হয়েছিল। আত্মজীবনীতে উল্লেখ না থাকলেও সম্ভবত অপরিণত বুদ্ধির কারণে অভিভাবকগণ বারো বছর বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁকে বিয়ে দেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের সমাজে ব্যাপকভাবে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। রামমোহনের বিবাহিত জীবনে আট বছর বয়সে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। বিদ্যাসাগরের বিয়ের সময় বয়স ছিল চোদ্দ, স্ত্রীর আট। বঙ্কিমচন্দ্র দশ বছর বয়সে আট বছরের কন্যাকে বিয়ে করেন। এস. ওয়াজেদ আলী সাত বছর বয়সে আড়াই বছর বয়সের চাচাত বোনকে বিয়ে করেন।<sup>১১</sup>

ঠাকুর পরিবারেও বাল্য বিয়ের প্রচলন ছিল, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ছিল নয় বছর।<sup>১২</sup>

বিয়ে উপলক্ষে রাসসুন্দরী তাঁর প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করেন:

তখন আমার মনে বেশ আত্মদ উপস্থিত হইল, বিবাহ হইবে, বাজনা আসিবে, সকলে হুলু দিবে, দেখিব ... পরে ক্রমেই আমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব দিবস অলঙ্কার, লালসাড়ি, বাজনা প্রভৃতি দেখিয়া আমার ভারি আত্মদ হইল। আমি হাসিয়া হাসিয়া সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। ঐ ব্যাপার সমাপন হইয়া গেলে পর দিবস প্রাতে সকল লোকে আমার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওরা কি আজি যাবে? তখন আমি ভাবিলাম, ঐ যাহারা আসিয়াছে তাহারাই যাইবে। পরে আমাদের বাহির বাটিতে নানা প্রকার বাজনার ধুমধাম আরম্ভ হইল।<sup>১৩</sup>

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাবার পালা। পালকি ও নৌকায় চড়ে তিন দিন পরে শ্বশুরবাড়ি ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামে পৌঁছান। পুরো যাত্রাপথটি রাসসুন্দরীর অশ্রুজল ঝরেছিল। এই দৃশ্য গ্রাম বাংলার খাঁটি চিত্র। কন্যার বিদায়কালে শুধু পরিবার

নয় গ্রামের পাড়া প্রতিবেশীরাও শোকে কাতর হতেন । বিদায়কালে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন:

যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঠাবলী দিতে লইয়া যায় । সে সময়ে সেই পাঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে । আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল ।<sup>১৪</sup>  
শ্বশুরবাড়িতে অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত: পক্ষীটা, কি গাছটা, কি বেড়ালটা যা দেখিতাম তাহাতে আমার জ্ঞান হইত যে আমার বাপের বাড়ির দেশ হইতে আসিয়াছে ।<sup>১৫</sup>

বাঙালি রমণীর শ্বশুরবাড়ির ভিন্ন পরিবেশে মনে কি ভাব জন্মে ‘আমার জীবন’এ তারও বিবরণ পাই:

লোকে আমোদ করিয়া পাখি পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে । আমি ঐ পিঞ্জরেই জন্মের মতো বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই ।<sup>১৬</sup>

সংসার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে রাসসুন্দরীর একটা বিশেষ বোধের জন্ম হয় । সমাজ, সংসারে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন হন । নতুন বৌ হয়ে তিনি আদর, যত্ন পেয়েছিলেন । ধীরে ধীরে তাঁর কর্তব্য পালনে অর্থাৎ সাংসারিক কাজে তাঁকে সক্রিয় হতে হয়েছিল । তাঁর শ্বশুরবাড়ির কাজের ধরন দেখে তিনি বলেছেন:

আমি ব্যাকুল চিন্তে ঐ সকল কাজের তরঙ্গ দেখিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম ।  
আমা হইতে এত কাজ হওয়ার কোনো মতেই সম্ভাবনা নাই ।<sup>১৭</sup>

তিনি আত্মকথায় দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সেটি তাঁর ব্যক্তি জীবনের চিত্র নয়, চিত্রটি সেকালের বাঙালি বধুদের দিনযাপনের চিত্র । তাঁর বর্ণিত সমাজে মহিলাদের দুর্দশা, অনাদর, স্বীকৃতির অভাব সবই স্পষ্ট হয়েছে । এ কর্মে শুধু তাঁকেই সক্রিয় হতে হয়নি, তাঁর পূর্ব প্রজন্মের শাস্ত্রিকেরও একই ধরনের গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতে হতো । এই ছিল সেকালের সমাজের রীতি । তাঁর বর্ণনায়:

সংসারের খাওয়া দাওয়ার কর্ম সারিয়া কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত । যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোনো কর্ম নাই । সেকালে এখনকার মতো চিকন কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল, কাহার সঙ্গেই কথা কহিতাম না । সে কাপড়ের বাহিরে দৃষ্টি হইত না । যেন কলুর বলদের মতো দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত । আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্যকোন দিকে দৃষ্টি চলিত না । এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্মের রীতি ছিল । আমি ঐ রীতি মতেই চলিতাম ।<sup>১৮</sup>

রাসসুন্দরী সংসার জীবনের বিবরণে নারী হয়ে জন্মানোর জন্য খেদ প্রকাশ করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রথম মা হন, একচল্লিশ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের জন্ম দেন। তেইশ বছরে তাঁর বারোটি সন্তান জন্মেছিল। সন্তান পালন এবং গৃহের সমুদয় কাজ একাই করতেন। বাড়িতে বিগ্রহ ছিল, তার সেবায় অল্পব্যঞ্জন ভোগ প্রস্তুত করতে হতো। বাড়ির লোকের রান্না, সর্বোপরি অঙ্ক শাশুড়ির সেবা করতে হতো। তাঁর পূর্বে এই কাজ শাশুড়িই করতেন। সংসারের এই পরম্পরা রীতি তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেকালে সকল বাঙালি পরিবারে একই রীতি প্রচলিত ছিল। অমানুষিক পরিশ্রমে তিনি কতটা যাতনা ভোগ করেছেন তার উল্লেখ করেছেন:

আমার শরীরে যত্ন মাত্রও ছিল না। অন্য বিষয় দূরে থাকুক। দুবেলা আহাৰ প্রায় ঘটিত না। এমনি কাজের ভিড় ছিল। যাহা হউক সে সকল কথার প্রয়োজন নাই। বলিলেও লজ্জাবোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য।<sup>১৯</sup>

বিবাহিত জীবনে তাঁর বড় আক্ষেপ, তিনি মায়ের আকুল আহ্বানে পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি পাননি। নিজের সন্তানদের প্রতি তাঁর যে স্নেহ, মমতা, দুর্বলতা – মায়েরও একই অনুভূতি ছিল। মায়ের সান্নিধ্য লাভের ব্যগ্রতাকে পরিবারের লোকেরা গ্রাহ্য করেননি। তাঁর ভাষায়:

আমার মা আমাকে দেখিবার জন্য কত রোদন করিতেন এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই বা কত যত্ন করিতেন। আমি এখানে আসিয়া অবধি দায়মালি কারাগারে বন্দী হইয়াছি। এই সংসারে কাজ চলিবে না বলিয়া প্রাণান্তে আমাকে পাঠানো হইত না। তবে যদি কোনো ক্রিয়া উপলক্ষে আমার যাওয়া হইত, কিন্তু কয়েদী আসামীর মতো দুই চারদিন মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইত। ... আমি যে করারে যাইতাম, ঐ করার মতেই আসিতে হইত।<sup>২০</sup>

সেকালের পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তারই চর্চা হতো পরিবারে। গৃহবধূদের বাড়ির লোকের খাবার প্রস্তুত, স্বামীর যত্ন, সন্তানের পরিচর্যার মধ্যেই জীবন সীমিত ছিল। এই ধারণায় মানবিক মূল্যবোধের কোনো স্থান ছিল না। নারীর কামনা বাসনা চরিতার্থের কোনো সুযোগ ছিল না। মানুষের সঠিক মর্যাদাও তারা পেত না। সংসারে সমস্ত কর্তব্য পালন করেও সংকটকালে মায়ের আসন্ন মৃত্যুতে তিনি নিজ গ্রামে যাওয়ার অনুমতি পাননি। ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এতে তাঁর প্রতিক্রিয়া:

আমি এমন অধমা পাপীয়াসী, মায়ের মৃত্যুকালেও তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছি। আমি মাকে দেখিবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দূরদৃষ্টহেতু [যদৃষ্টং] কোনোক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এটি কি আমার সাধারণ আক্ষেপের বিষয়। হা বিধাতঃ তুমি কেনই বা আমাকে মানবকুলে সৃষ্টি করিয়াছিলে? পৃথিবীর মধ্যে পশু

পক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে, সর্বাপেক্ষা মনুষ্য জন্ম দুর্লভ বটে। সেই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহাপাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকূলে জন্ম হইয়াছিল। আমার জীবনে ধিক! পৃথিবী মধ্যে মাতারতুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়। এমন দুর্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্র সন্তান হইতাম, আর মার আসন্নকালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম পাখীর মতো উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জর-বন্ধ বিহঙ্গী।<sup>১১</sup>

উল্লিখিত বিবরণে রাসসুন্দরীর সমাজ সচেতনতার পরিচয় বিধৃত। নারী পুরুষের অসম অবস্থান তাঁকে পীড়া দিয়েছিল।

বাঙালির সামাজিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে এ দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয়। ইয়ং বেঙ্গল দলের তরুণদের মধ্যে এই সচেতনতা ছিল প্রবলতর। ধারণা করা যায় যে রামদিয়া গ্রামে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছায়নি। রাসসুন্দরী নিজের অন্তরের তাগিদেই লেখাপড়া শেখার আগ্রহ অনুভব করেন। পুঁথিপাঠের ইচ্ছা থেকেই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে শিক্ষা লাভ করেন। রাসসুন্দরী এ বিষয়ে চারণ করেছেন তাঁর স্মৃতি:

আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। ...এখন বুঝি মেয়ে ছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। ... এখন মাগের নাম ডাক, মিনসে জড় ভরত। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে।<sup>১২</sup>  
এখন মেয়ে মত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।<sup>১৩</sup>

এমন বিরূপ পরিবেশে রাসসুন্দরী পুঁথি পাঠের স্বপ্ন দেখেন। 'চৈতন্যভাগবত' পাঠ করে তিনি প্রথম পুঁথিপাঠ শুরু করেন। যে সব পুঁথি শ্বশুরবাড়ির সংগ্রহে ছিল রাসসুন্দরী ধীরে ধীরে সেসব পুঁথি-যেমন চৈতন্যচরিতামৃত আঠারো পর্ব, জৈমিনি ভারত, গোবিন্দ-লীলামৃত, বিদ্যমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকিপু্রাণ পড়েছিলেন। বাল্মীকি-পুরাণের শুধু আদিকাণ্ড বাড়িতে ছিল, পুত্র দ্বারকানাথ কলকাতা থেকে সপ্তকাণ্ড পাঠালে, তিনি সপ্তকাণ্ডও পাঠ করেছিলেন। প্রতিকূল পরিবেশে প্রথম দিকে পরিবারের সদস্য এমনকি সন্তানদের অজ্ঞাতে তিনি পুঁথি পাঠ আয়ত্ত করেন।

রাসসুন্দরী আক্ষরিক অর্থেই স্বশিক্ষিত ছিলেন। কিভাবে তিনি প্রথমে পড়তে এবং পরে লিখতে শিখেছিলেন সে কথা প্রায় অবিশ্বাস্য। তাঁর শৈশবে পিতৃগৃহে যে বালক বিদ্যালয় ছিল, মেম শিক্ষয়িত্রী বালকদের সে-পাঠদান করতেন। ঐ স্কুলের পাঠদানের পদ্ধতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন:



ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষরে মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চঃস্বরে পড়িত । ...আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম । সেকালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল । আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম ।<sup>২৪</sup>

বাড়ির বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা রাসসুন্দরীর পাঠ অর্জনের প্রথম সোপান । চৈতন্যভাগবত থেকে একটি পাতা সংগ্রহ করে, ছেলের হাতের লেখা তালপাতার একটি পাতা ও বাড়ির বিদ্যালয়ে যে অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন এই তিনটি একসঙ্গেই মিলিয়ে অদম্য উৎসাহে রাসসুন্দরী পড়তে শিখলেন । তাঁর নাতনি সরলবালা সরকার লিখেছেন- ‘অধ্যবসায়, স্মৃতিশক্তি অথবা ভগবানের কৃপা যাহাই হোক না ইহারই ভেতর ঠাকুর মা একটু একটু করিয়া অক্ষর চিনিতে ও ভাগবতের পাঠ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন’ ।<sup>২৫</sup> রাসসুন্দরী তাঁর অভিপ্রায় পূরণের উল্লেখ করেছেন:

অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি গোঙ্গাইয়া পড়িতে শিখিলাম । সেকালে এমন ছাপার অক্ষর ছিল না । সে সকল হাতের লেখা অক্ষর পড়িতে ভারি কষ্ট হইত । আমার এত দুঃখের পড়া ।<sup>২৬</sup>

তিনি পড়তে শিখে পুঁথি পাঠেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, লিখতে শিখেছেন । পুত্রের আগ্রহেই তাঁর চিঠির উত্তর দেয়ার জন্যই লেখা আয়ত্ত করেন । পড়া ও লেখা শিখে গদ্য ও পদ্য রচনা করে নিজের জীবনকথা লিখেছেন ।

রাসসুন্দরী ধর্মানুরাগী ভগবৎপরায়ণ ছিলেন । শৈশবে তাঁর ভয় দূর করার জন্য মা তাঁকে ধর্ম-চর্চায় প্রাণিত করেন । জীবনের দুঃখ, কষ্ট, শোক নিবারণের জন্য তাঁদের বাড়ির গৃহদেবতা (ঈশ্বরের বিগ্রহ) দয়ামাধবকে স্মরণ করার উপদেশ দেন । মায়ের এই অভয়মন্ত্রটি রাসসুন্দরীর জীবন-মন্ত্রে পরিণত হয় । দীর্ঘ জীবনের নানা সংকটে দয়ামাধবকে স্মরণ করে সাহসলাভ করেন । রাসসুন্দরীর ধর্মচিন্তা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

ইহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম । জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন ।<sup>২৭</sup>

তাঁর স্বদেশ সম্পর্কে ধারণা পিত্রালয় বা শ্বশুরালয়ের অঞ্চলে সীমিত ছিল না । তাঁর স্বদেশ যে ভারতবর্ষ তা তিনি উপলব্ধি করেছেন । তিনি লিখেছেন: ‘আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম ।’<sup>২৮</sup>

দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে রাসসুন্দরী বিশেষ উল্লেখ করেননি । স্বামীর সঙ্গে সংসার সন্তান, সম্পত্তি বা কোনো ঘটনা বিষয়ে কথোপকথনের বিবরণ নেই । সংসারে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মনে হয় । বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্ব লাভ করেনি । তিনি একে ‘দেশাচার’ বলেও মনে নিয়েছেন । একটি বাক্যে তিনি স্বামীর পরিচয় তুলে ধরেন, ‘আমি যে লোকের

অধীনী হইয়া একাল পর্যন্ত দিবস গত করিয়াছি বাস্তবিক তিনি বেশ ভালো লোক ছিলেন ।<sup>১২৯</sup>

স্বামী সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন:

তিনি বিলক্ষণ প্রতাপবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন – তাঁহার বিশ পঁচিশটা মোকদ্দমা লাগাই থাকিত । ভারী ভারী লোকের সঙ্গে তাঁহার কাজিয়া ছিল । কিন্তু কখনো কাহার নিকট পরাজিত হইতেন না, মোকদ্দমা জয় করিয়া আসিতেন ।<sup>১৩০</sup>

রাসসুন্দরী তাঁর জীবনকে শুধু সংসারের কাজে ব্যাপ্ত রাখেননি । বৈষয়িক সংকট নিষ্পত্তি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । একদা স্বামী বৈষয়িক কাজে রামদিয়ার বাইরে ছিলেন । স্বামীর পরিবারের তিন পুরুষের শত্রু দক্ষিণ বাড়ি নামক স্থানে অবস্থানরত জমিদার ‘মিরালি আমুদ’ নামের একজন জমিদার তাদের প্রজাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করে । অত্যাচারের বিবরণ শুনে রাসসুন্দরীর মন বিচলিত হয়, তিনি প্রতিকারে উদ্যোগী হন:

আমি ততুল্য মামলা মোকদ্দমা কিছুই বুঝতে পারি না । বিশেষতঃ এ সকল কর্মের কর্তাও নহি । উহাদের কান্না দেখিয়া এবং ঐ সকল যাতনা মনে করিয়া আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল । আমার যে ছেলেটি লইয়া বাটিতে আছি, সে ছেলেটিও পত্র লেখার উপযুক্ত হয় নাই । তখন আমি ঐ ছেলেটিকে উপলক্ষ করিয়া একখানি পত্র দিয়া একজন লোককে মিরালি আমুদের নিকট পাঠাইয়া দিলাম । ঐ পত্র পাইয়া মিরালি আমুদ পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রজাদের খালাস দিলেন, এবং মিরালি আমুদ নিজে উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদিগের প্রধান দুইজন মুরকিবকে আমাদিগের বাটিতে পাঠাইয়া সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন ।<sup>১৩১</sup>

বৈষয়িক বিরোধ মেটানোর এই প্রচেষ্টা সেকালের পরিবেশে একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা । তাঁর মমত্ববোধের দায় থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন । এই প্রয়াস তাঁর চরিত্রকে বিশেষ মর্যাদা দান করে ।

তাঁর জীবনে আর্থিক সচ্ছলতাকে তিনি কখনও গুরুত্ব দেননি । জীবনে চলার পথে দুঃসময়গুলোকেই তুলে ধরেছেন । তাঁর জীবনের সংকটগুলো তিনি শুধু নিজের মনে করেননি, মানুষ মাত্রকেই নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয় । শোকাহত মানুষের এই সময়ের মানসিক অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

আমার পৌত্র, দৌহিত্র এবং ছয়টি পুত্র আর একটি কন্যা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে । ... লোকে বলে অস্ত্রের প্রহার আর পুত্রশোক এই দুইটি সমান কথা । অস্ত্রাঘাত মনুষ্যের শরীরে যদি অধিক পরিমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে । আর যদি কিছু অল্প পরিমাণে হয়, তাহা হইলে যে পর্যন্ত শরীরে অস্ত্রের ঘা থাকে, সেই পর্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয় । ... শোকাঘাত যাবজ্জীবন পর্যন্ত থাকে । শোকে লোকের যেরূপ দুর্দশা হয়,

এরূপ আর কিছুতেই হয় না। শোক হইলে লোক মৃত্যু ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর অধিক ফল হয়।<sup>৩২</sup>

রাসসুন্দরীর এই মত তাঁর ব্যক্তি জীবন ছাড়িয়ে সার্বজনীন মত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি মানুষের জীবন, মন, সুখ দুঃখ নিয়ে চিন্তা করেছেন, এগুলো সম্পর্কে তাঁর একটা নিজস্ব ভাবনা গড়ে উঠেছে, মনোজগৎ তৈরি হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

সন্তান হইতে মাতা পিতার যেমন নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মনুষ্যকে এত যন্ত্রণা আর কিছুতেই ভোগ করিতে হয় না। সন্তান কুসন্তান হইলে তাহার জীবিত অবস্থাতেই যন্ত্রণা, মরিয়া গেলেও যন্ত্রণা। বস্তৃত পিতার অপেক্ষা এ বিষয়ে মাতার যন্ত্রণাই বেশি।<sup>৩৩</sup>

রাসসুন্দরীর জন্ম ১৮০৯ সালে মৃত্যু ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই শতকে বাংলাদেশে মূল্যবোধের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি তাঁর পরিণত বয়সে খ্রীশিক্ষার প্রচলনকে স্বাগত জানান। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য:

এখনকার মেয়েছেলেগুলো যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে। সে কত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখায়।<sup>৩৪</sup>

একই সঙ্গে তিনি তাঁর সময়কে স্মরণ করেছেন:

সেকালের লোকের সেই মোটা মোটা কাপড়, ভারী ভারীগহণা, হাতে পরা শাঁকা, কপালভরা সিঁদুর ... আমাদের সকল পরিচ্ছদ যদিও সে প্রকার ছিল না, তথাপি যাহা ছিল তাহাই মনে হইলে ঘৃণাবোধ হয়।<sup>৩৫</sup>

তিনি ছয় দশকের জীবন ও সমাজকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন:

যাহা হউক, যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলা হইল। এই আমার ৬০ বৎসরের বিবরণার্থকিঞ্চিৎ লিখিত থাকিল, আমার নাম মা, আমার পিত্রালয়ে যে নাম ছিল, তাহা তো অনেককাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।<sup>৩৬</sup>

বাংলায় প্রথম আত্মজীবনী রাসসুন্দরীর দাসীর 'আমার জীবন' আমাদের গদ্যসাহিত্যের ধারায় একটি তাৎপর্যবহু সৃষ্টি। এই গ্রন্থের মহিমা ও গুরুত্ব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখ শনাক্ত করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের শতবর্ষ পরেও আধুনিক সাহিত্য সমালোচকেরা বইটিকে উপেক্ষা করেছেন, বললে, অত্যাুক্তি হবে না। এই উপেক্ষার অন্যতম কারণ গ্রন্থটি দীর্ঘকাল দুস্প্রাপ্য ছিল। তবে এখন বইটি সুসম্পাদিত হয়ে পুনঃপ্রকাশ পাওয়ায়, তা আমাদের সামনে এসেছে।

'সাহিত্যসমাজের দর্পণ-এই পরিশ্রেণিতে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী পর্যালোচনার প্রয়াস আছে এই প্রবন্ধে। ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও দেশকালের যে চিত্র ধরা পড়েছে,

তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। তাঁর রচনার প্রধান গুণ সরলতা ও প্রাঞ্জলতা। তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য সরল সৌন্দর্য। এই আত্মজীবনীতে সমাজে নারীর অবস্থান, নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান বিধৃত।

দীনেশচন্দ্র সেনের সহৃদয় মন্তব্য উদ্ধারকরে রাসসুন্দরীর অবদান উপলব্ধি করা যায়: কোনো পুরুষ শত প্রতিভা বলেও রমণীহৃদয়ের গৃঢ় কথার এমন আভাস দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।<sup>৩৭</sup>

### তথ্যসূত্র

১. 'বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন', আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'মুনীর চৌধুরী রচনা সমগ্র-৩' ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০০১, পৃ ৯৪
২. মুনীর চৌধুরী ১৯ শতকের শেষ দশক থেকে ২০ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত আত্মজীবনীকারদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন রাসসুন্দরী, বিদ্যাসাগর, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম। ঐ পৃ ৯৩
৩. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত) রাসসুন্দরী দাসী 'আমার জীবন' নয়! দিল্লী; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ix
৪. সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃ.মু ২০১৫, পৃ ১০৩
৫. সুকুমার সেন, ঐ, পৃ ১০৪
৬. উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া', ঢাকা, অবসর ২০১৩, পৃ ৪
৭. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৫
৮. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ১২
৯. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ১৩
১০. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৪২-৪৩
১১. আনিসুজ্জামান, বাঙালি নারী - সাহিত্যে ও সমাজে, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ ৪৪
১২. নিতাপ্রিয় ঘোষ 'বাল্য বিবাহ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্র বিষয়ক কড়চা' কলকাতা, ২০১০ পৃ ২১৫
১৩. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ১৮
১৪. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ১৯
১৫. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ২৪
১৬. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ২১
১৭. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ২৬
১৮. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ২৬

১৯. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৩০-৩১
২০. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৩৩
২১. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৩৩
২২. সম্ভবত ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার (রাজত্বকাল ১৮৩৭-১৯০১) কথা বলেছেন
২৩. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ২৮
২৪. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৮
২৫. পরিশিষ্ট 'আমার ঠাকুর মা' আমার জীবন পৃ ১১৯
২৬. পরিশিষ্ট 'আমার ঠাকুর মা' আমার জীবন পৃ ৩৮-৩৯
২৭. 'প্রস্তাবনা' আমার জীবন তৃ মু ২০১৭ পৃ viii
২৮. রাসসুন্দরী দাসী, ঐ, পৃ ৫
২৯. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, পৃ ৩৮
৩০. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, পৃ ৭৮
৩১. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, পৃ ৭৯
৩২. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, পৃ ৫০
৩৩. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, ৪৪
৩৪. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, ৩৮
৩৫. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, ৩৮
৩৬. রাসসুন্দরীদাসী, ঐ, ৭৬
৩৭. 'গ্রন্থ পরিচয়' 'আমার জীবন' পৃ xi

### সহায়ক রচনাপঞ্জি

আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, ঢাকা: অবসর, ২০১৩।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ, *রবীন্দ্র-বিষয়ক কড়চা*, কলকাতা: একুশ শতক, ২০১০।

বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন*, নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, (তৃ-স) ২০১৭।

মুনির চৌধুরী, *মীর-মানস, মুনির চৌধুরী রচনাবলী ৩ (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত)*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০১।

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, তৃ-স ২০১৫।